

সৌদি-তুরস্ক-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা জোট : সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও আঞ্চলিক বাস্তবতা

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে গত ৭ আগস্ট মক্কা আল-মুকাররমায় এক শীর্ষ ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য এবং বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা কাঠামোর সূচনা হয়েছে। সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মধ্যকার এই চুক্তির মূল নীতি হলো, এক দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণকে তিন দেশের সবার ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি সামরিক সহযোগিতা, গোয়েন্দা তথ্যাদান প্রদান, যৌথ মহড়া এবং প্রতিরক্ষাশিল্পে সহযোগিতার একটি কাঠামো এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও তিন দেশ বলছে যে, এটি একটি সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক জোট, তবে কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, এই প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোটের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

এই চুক্তি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা এটি। সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দশক ধরে ঘনিষ্ঠ সামরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে সৌদি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অন্য দিকে সৌদি আরবও বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক সংকটে পাকিস্তানকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। ২০২৫ সালে স্বাক্ষরিত সৌদি-পাকিস্তান কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তিকে এই চুক্তির একটি বড় ভিত্তি হিসেবে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ২০২৬ সালের আঞ্চলিক সংকটের সময় পাকিস্তান আট হাজার সেনা, একটি যুদ্ধবিমান স্কোয়াড্রন এবং একটি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৌদি আরবে মোতায়েন করেছিল। এতে প্রমাণিত হয়, দু'দেশের সম্পর্ক কেবল কূটনৈতিক ঘোষণায় সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তবেও তা সামরিক সহযোগিতার রূপ নিতে পারে।

তুরস্কের অন্তর্ভুক্তি এই নতুন ব্যবস্থার কৌশলগত গুরুত্ব বহু গুণ বাড়িয়েছে। ন্যাটোর সদস্য হিসেবে তুরস্কের রয়েছে জোটে অন্যতম বৃহৎ সশস্ত্রবাহিনী। উন্নত যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা এবং বিকাশমান দেশীয় প্রতিরক্ষাশিল্প। ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, ইলেকট্রনিক যুদ্ধব্যবস্থার ব্যবস্থা, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এবং নৌযাননির্মাণে তুরস্কের সাফল্য ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্য দিকে পাকিস্তানের রয়েছে পরমাণু ও যুদ্ধ-অভিজ্ঞ একটি সামরিক বাহিনী। ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষাশিল্প। সর্বোপরি পারমাণবিক প্রতিরোধ সক্ষমতা। সৌদি আরবের আছে বিপুল আর্থিক সামর্থ্য। আধুনিক পশ্চিমা অস্ত্রভাণ্ডার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। আরব ও মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রভাব।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) তথ্যানুযায়ী, ২০২৫ সালে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল ৮৩.২ বিলিয়ন ডলার। তুরস্কের ৩০ বিলিয়ন ডলার। পাকিস্তানের ১১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। তিন দেশের সম্মিলিত সামরিক ব্যয় ১২৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। শুধু ব্যয়ের পরিমাণ কোনো কার্যকর সামরিক জোট গড়ে তোলে না। তবে এই পরিসংখ্যান দেখায়, একটি শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তুলতে জোটের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও সামরিক সক্ষমতা আছে।

এ জোটের ভৌগোলিক গুরুত্বও কম নয়। তুরস্ক ইউরোপ, ভূমধ্যসাগর, ককেশাস ও মধ্যপ্রাচ্যের সংযোগস্থলে অবস্থিত। সৌদি আরব লোহিত সাগর ও আরব উপসাগরের মাঝখানে আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। সেই সাথে বিশ্বের অন্যতম জ্বালানি উৎপাদক। পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়াকে মধ্য এশিয়া, চীন, ইরান এবং আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। ফলে তিন দেশ মিলে পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডোর গঠন করতে পারে, যার অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি ও বাণিজ্যিক সমুদ্রপথ।

এই চুক্তির সবচেয়ে বড় সম্ভাব্য সুবিধা হলো—প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানো। এখন কোনো রাষ্ট্র যদি সদস্য তিন দেশের যেকোনো একটির বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা চিন্তা করে, তবে তাকে একই সাথে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। প্রতিরক্ষাশিল্পে সহযোগিতা চুক্তিটির আরেকটি বড় সম্ভাবনা। তুরস্ক ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাকিস্তান যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, সাঁজোয়া যান ও গোলাবারুদ উৎপাদনে সক্ষম। চীনের সাথে যৌথভাবে জেএফ-১৭ যুদ্ধ বিমান উৎপাদন করেছে। অন্য দিকে সৌদি আরব ভিশন-২০৩০ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশীয় প্রতিরক্ষাশিল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। সৌদি মূলধন, তুরস্কের প্রযুক্তি এবং পাকিস্তানের উৎপাদন সক্ষমতার সমন্বয় ঘটাতে পারলে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং উন্নত সামরিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি সম্ভব হবে। একই সাথে বিদেশি অস্ত্র সরবরাহকারীদের ওপর নির্ভরতাও কমবে।

গোয়েন্দা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও চুক্তিটির তাৎপর্য আছে। সন্ত্রাসবাদ, সাইবার হামলা, ড্রোন যুদ্ধ, সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার মতো অভিন্ন হুমকির মুখোমুখি তিন দেশ। কার্যকর গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, যৌথ সামরিক মহড়া এবং সমন্বিত পরিকল্পনা অনাকাঙ্ক্ষিত শত্রুতা, সাইবার অপরাধ এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর বিপুল জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সামরিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন নিজস্ব কোনো কার্যকর সম্মিলিত নিরাপত্তাকাঠামো গড়ে ওঠেনি।

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ৫৭টি সদস্যরাষ্ট্র থাকলেও এটি মূলত একটি রাজনৈতিক সংগঠন; সামরিক জোট নয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কা চুক্তি মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি নতুন নিরাপত্তাকাঠামোর সূচনা হতে পারে।

তবে ত্রিমুখী এই চুক্তির কিছু চ্যালেঞ্জও আছে। তিনটি দেশের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার এক নয়। পাকিস্তানের প্রধান নিরাপত্তা উদ্বেগ দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের বিরোধ। তুরস্কের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার সিরিয়া, ইরাক, পূর্ব ভূমধ্যসাগর, ককেশাস, ন্যাটো এবং রাশিয়া। অন্য দিকে সৌদি আরবের মূল উদ্বেগ ইরান, ইয়েমেন, উপদ্বীপের নিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি অবকাঠামোর সুরক্ষা।

ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়। যদি পাকিস্তান ভারতের সাথে বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে কি সৌদি আরব ও তুরস্ক সরাসরি সামরিক সহায়তা দেবে? আবার সৌদি আরব যদি ভবিষ্যতে ইরান বা ইরান-সমর্থিত কোনো গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষে জড়ায়, তাহলে পাকিস্তান কি সামরিকভাবে অংশগ্রহণ করবে? একইভাবে সিরিয়া বা পূর্ব ভূমধ্যসাগর ঘিরে তুরস্ক বড় ধরনের সংঘাতে জড়ালে সৌদি ও পাকিস্তানের অবস্থান কী হবে? এসব প্রশ্ন বলে দেয়, রাজনৈতিক ঘোষণা দেওয়া যত সহজ, কার্যকর সম্মিলিত প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলা তত সহজ নয়।

পরিস্থিতি আরো সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে এ কারণে, পাকিস্তান ও ভারত উভয়ই পারমাণবিক শক্তিদর রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক কিছু গবেষণা সংস্থার তথ্য—পাকিস্তানের কাছে আনুমানিক ১৭০টি এবং ভারতের কাছে ১৯০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড আছে। যদিও নতুন এই চুক্তিতে পারমাণবিক সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত নয়; তবু পাকিস্তানের পারমাণবিক সক্ষমতা জোটটির কৌশলগত গুরুত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিতর্ক তৈরি করতে পারে। তুরস্কের ন্যাটো সদস্যপদও একটি বাস্তবতা। ন্যাটোর অনুচ্ছেদ-৫ অনুযায়ী, তুরস্ক ইতোমধ্যে একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অংশ। ফলে ভবিষ্যতে ন্যাটোর দায়বদ্ধতা এবং নতুন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির দায়বদ্ধতার কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে আল্লাহর জন্য তা কূটনৈতিক ও কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

ইরানের সাথে সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরব ও ইরান আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উভয় দেশ উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের সাথে ইরানের দীর্ঘ সীমান্ত আছে। ইসলামাবাদের জন্য তেহরানের সাথে স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখা জাতীয় স্বার্থের বিষয়। তুরস্ক ও ইরানের সাথে আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ফলে রেসিডেন্ট যদি এই চুক্তিকে সরাসরি ইরানবিরোধী সামরিক জোট হিসেবে দেখে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা ও মেরুকরণ হতে পারে।

ভারতের কোণঠাসা একই ধরনের ভাবনাময় রক্ষা দরকার। পাকিস্তান স্বাভাবিকভাবে এ জোটকে নিজের কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী সুযোগ হিসেবে দেখবে; কিন্তু সৌদি আরবের সাথে ভারতের শক্তিশালী আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। তাই রিয়াদ এমন কোনো অবস্থান নেবে বলে মনে হয় না, যা নতুন করে দিল্লির সাথে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে। একইভাবে ইসরাইল প্রসঙ্গেও তিন দেশের নীতিতে পার্থক্য বিদ্যমান। এসব নীতিগত পার্থক্য ভবিষ্যতে অভিন্ন নিরাপত্তা লক্ষ্য নির্ধারণকে জটিল করতে পারে।

এ ধরনের সম্মিলিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি—অনিচ্ছাকৃতভাবে বৃহত্তর সংঘাতে জড়িয়ে পড়া। একটি সীমান্ত সংঘর্ষ, ক্ষেপণাস্র হামলা কিংবা ভুল সামরিক হিসাব একটি দ্বিপক্ষীয় বিরোধকে সহজে বহুপক্ষীয় সংঘাতে রূপ দিতে পারে। তাই কোনো পরিস্থিতিতে ‘সশস্ত্র আক্রমণ’ হিসেবে গণ্য করা হবে আর কোন অবস্থায় সম্মিলিত প্রতিরক্ষা দ্বারা কার্যকর হবে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো কী ধরনের সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবে—এসব বিষয় স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ চুক্তিটির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা সামগ্রিক উন্নয়ন এর উদ্দেশ্য সূচি না করা। সেই সাথে একটি স্থায়ী দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত যৌথ টাস্কফোর্স, নিয়মিত পর্যায়ক্রমিক পরামর্শ, কার্যকর সামরিক সমন্বয় কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন। এসব কার্যক্রম অবশ্যই বেসামরিক ও সাংবিধানিক কর্তৃত্বের আওতায় পরিচালিত হওয়া উচিত।

সামগ্রিক দিক ছাড়াও এ চুক্তি অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও দ্বিগুণ খুলতে পারে। প্রতিরক্ষাশিল্পে যৌথ বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া লোহিত সাগর, আরব উপসাগর ও আরব সাগরের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথের নিরাপত্তা, জ্বালানি অবকাঠামোর সুরক্ষা এবং সাইবার নিরাপত্তা ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ সুফল এনে দিতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি যদি প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ দমন, গোয়েন্দা সহযোগিতা, সামগ্রিক নিরাপত্তা, সাইবার প্রতিরক্ষা, যৌথ প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরক্ষাশিল্পে সহযোগিতার একটি বাস্তবসম্মত কাঠামোতে পরিণত হয় তবে তা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। যদি কোনো নির্দিষ্ট

রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে প্রাথমিক বা সাম্প্রদায়িক সামরিক জোটে পরিণত হয়, তবে তা হিতে বিপরীত ঘটাতে পারে। ভূরাজনৈতিক বিভাজন গভীর করবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মৌলিক জাতীয় স্বার্থের বাইরে সংঘাতে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

তবে এ কথা বলা যায়, এই তিন শক্তির সমন্বয় নিঃসন্দেহে একটি প্রভাবশালী আঞ্চলিক নিরাপত্তা অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে পারে। ইতিহাস এই চুক্তি কিভাবে মূল্যায়ন করবে, তা নির্ভর করবে রিয়াদ, আব্বাধা এবং ইসলামাবাদ কতটা প্রজ্ঞা, সংযম ও দূরদর্শিতার সাথে নিজেদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে পারে তার ওপর। এই জোটে প্রতিটি সদস্যতা তিনটি যুদ্ধ একসঙ্গে লড়তে পারে, তা নিয়ে নয়; বরং মিডিয়া সম্মিলিত কূটনীতি, সহযোগিতা এবং প্রতিরোধক্ষমতায় কতটুকু সাফল্য দেখাতে পারে, তা-ই হবে এর সর্বোচ্চ সাফল্যের মাপকাঠি।

● লেখক: মেজর জেনারেল (অব.) রোকন উদ্দিন